ইউজিসি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন

শিক্ষা

আলতাফ হোসেন রাসেল
সভাপতি, পরিসংখ্যান বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

গত ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ১৪৬তম সভায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি-পদোন্নয়ন বিষয়ে এক অভিন্ন নীতিমালা গৃহীত হয়। এ নীতিমালার ভূমিকায় বলা হয়, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সমান নয় এবং এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে এক ধরনের বৈষম্য বিরাজমান। এই বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ও সাম্প্রতিককালে 'জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫' প্রণয়নের পর শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমরাও মনে করি, আমাদের শিক্ষার মানোন্নয়ন খুবই জরুরি। আমরাও বিশ্বাস করি, ওই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক অসঙ্গতি ও সমস্যা বিরাজমান। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেছিলেন। এই অধ্যাদেশের অধীনে থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্দিষ্ট বাস্তবতায় নিজেদের মতো করে নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট ও সিনেটের। সিনেট অবশ্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সিনেট নেই সেখানে সিন্ডিকেট সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি প্রণয়নের এই সর্বোচ্চ বডিগুলোতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব থাকে। তাই ইচ্ছা করলেই নিজেদের স্বার্থে দিনকে রাত করার কোনো সুযোগ নেই। উচ্চশিক্ষার এ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়ন ও যুগোপযোগী করা একটি চলমান প্রক্রিয়া।

স্বায়ত্তশাসন প্রদানে ধরে নেওয়া হয়েছিল, উচ্চশিক্ষার এ প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকরা বিবেক দ্বারা পরিচালিত হবেন। বাস্তবেও তাই হওয়া উচিত। শিক্ষকরা যদি বিবেকহীন হয়ে যান তাহলে দেখতে হবে, কেন এমনটা হচ্ছে। বিবেকহীনতার সমাধান কিন্তু বিবেক দিয়েই করতে হবে। তা না করে কিছু বিশেষ রোগের শুধু লক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করার মতো বিবেকহীনতার দায় মেনে নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি কর্তৃক চিহ্নিত উপরোল্লিখিত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসঙ্গতিগুলো, বিশেষত নেতৃস্থানীয় শিক্ষকদের নীতিহীনতা ও বিবেকহীনতার কিছু লক্ষণ মাত্র। এই তথাকথিত অভিন্ন নীতিমালা দিয়ে নীতিহীন ও বিবেকহীন শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণ কিংবা সংশোধন করা সম্ভব নয়। উপরন্তু এটি ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের মূল চেতনা পরিপন্থী।

প্রতিবছর অনেক নীতি সংশোধন ও পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়ে এবং আমরা তা করে থাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট ও সিনেটের মাধ্যমে। কাভার ও দুয়েকটি ফাঁকা পেজসহ মাত্র ১৮ পৃষ্ঠার একটি নীতিমালা দিয়ে এতগুলো স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হতে পারে না। কারণ এটি বাস্তবায়িত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট ও সিনেট অনেকাংশেই গুরুত্ব হারাবে এবং একটা সময়ে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। এই নীতিমালা এক কথায় ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশকে প্রশ্নবিদ্ধ ও চ্যালেঞ্জ করে। শিক্ষার মানোন্নয়নের ছদ্মাবরণে উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে এটি প্রকৃতপক্ষে একটা গভীর ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। 'জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫'-এ ন্যায্য বেতন কাঠামো ও গ্রেডের দাবিতে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আন্দোলনরত, তখন আমলারা এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। এক পর্যায়ে যখন শিক্ষকরা নিজেদের দাবির বিষয়ে অনড়, তখনই অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ইউজিসিকে জোর চাপ দেওয়া হয়। আমরা মনে করি, শিক্ষকদের বেতন কাঠামো ও গ্রেড নিয়ে আমলাদের সঙ্গে এ দ্বন্দ্ব না হলে অভিন্ন নীতিমালা নামের এমন কোনে কিছু দৃশ্যমান হতো না। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের বিরক্তিকর প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী হয়তো একটা নির্দেশনা দিয়েছিলেন; সেটা নিশ্চয়ই তার বাবা বঙ্গবন্ধুর সৃষ্টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের চেতনার বিরুদ্ধে নয়। এই নীতিমালা দিয়ে বৈষম্য দূরীকরণ ও চিহ্নিত সংকট নিরসন কোনোটাই ঘটবে না। আমরা মনে করি– সময়, সুযোগ ও বাস্তবতার বৈষম্য দূরীকরণ পূর্বশর্ত। আর বেতন কাঠামো নিয়ে সৃষ্ট সংকট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ধ্বংসের মাধ্যমে কীভাবে নিরসন হয়, তা বোধগম্য নয়। বাংলাদেশে এখন ৩৮টির মতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মান সমান এটা ভাবা অবাস্তব। ছাত্র ও শিক্ষকের গড়পড়তায় মানের ভিন্নতা আছে। এসএসসি-এইচএসসির রেজাল্ট ও মেধার ভিত্তিতে ছাত্ররা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়। এসএসসি-এইচএসসির সিজিপি ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর কয়েক বছর লেগেছিল এ নতুন ব্যবস্থাটিকে স্থির করতে। পরবর্তী বছরগুলোতে যে হারে সিজিপিতে ভালো রেজাল্ট করেছে, শুরুর কয়েক বছর সে হারে ভালো করতে পারেনি। শুরুর দিকে যারা এসএসসি-এইচএসসিতে ভালো করতে পারেনি এদের মধ্যে অনেকেই অনার্স ও মাস্টার্স অনেক ভালো ফল করেছে। অথচ নতুন অভিন্ন নীতিমালায় এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার আবেদন করতে পারবে না। আমরা জানি, এর জন্য ছাত্ররা দায়ী নয়। সরকারকেও দোষারোপ করছি না। কারণ, একটা নতুন ব্যবস্থায় স্থির হতে গেলে কিছুদিন সময়ের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু তাই বলে অভিন্ন নীতিমালার নামে এই দায় সিজিপি রেজাল্টধারী প্রথমদিককার ছাত্রদের ওপর চাপানো অনুচিত। এটা একটা সময়ের বৈষম্য, তা সময় দিয়েই দূর করতে হবে। ইতিমধ্যে যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন, তাদের পদোন্নয়নের ক্ষেত্রেও অভিন্ন নীতিমালায় নতুন বৈষম্য ও সংকট সৃষ্টি করবে। এ অভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়ন হলে অনেক শিক্ষকের মধ্যে পদোন্নয়নে দিন কিংবা মাসের পার্থক্য বছরে রূপ নেবে। ব্যবস্থার এ পরিবর্তন নিরবচ্ছিন্ন হবে না। পৃথিবীর ইতিহাস বলে, ব্যবস্থার এ ধরনের 'ঝাঁপ দেওয়া' পরিবর্তন কখনও সফল হয়নি। আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে সফল পরিবর্তনগুলো হয়েছে নিরবচ্ছিন্নভাবে ও ধাপে ধাপে।

এই অভিন্ন নীতিমালাটি সময়, সুযোগ ও বাস্তবতার মতো অনেক কারণে সৃষ্ট বহুমাত্রিক বৈষম্যের অবৈজ্ঞানিক সাধারণিকরণ। এতে সংকট আরও ঘনীভূত হবে। গণতন্ত্রের সমস্যার সমাধান যেমন অধিকতর গণতন্ত্র দিয়ে করতে হয়, অনুরূপভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের সমস্যা ও সংকটের নিরসনও কিন্তু আরও উন্নতমানের স্বায়ত্তশাসন দিয়ে করতে হবে। অন্য একটা শ্রেণির সঙ্গে অবৈধ মিলন ও বিচ্ছেদ ছাড়া সমাজের একটা শ্রেণির পক্ষে সামগ্রিকভাবে চরিত্রহীন হওয়া অসম্ভব। এই দুই শ্রেণির অবৈধ সম্পর্কই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াটিকে অনেকাংশে অস্বচ্ছ করে তুলেছে আর অভিন্ন নীতিমালার নামে এর দায় চাপানো হচ্ছে নির্দোষ প্রার্থীদের ওপর। তা না করে বরং এই আন্তঃশ্রেণি সম্পর্কটিকে বৈধকরণ জরুরি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সমস্যা, সংকট ও উত্তরণের সঠিক তথ্য অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী সরাসরি এবং সময়মতো পান না। কিন্তু তিনি বারবার প্রমাণ করেছেন, একটু সময় নিয়ে হলেও সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে তিনি ভুল করেন না। অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবিত জনকল্যাণবিমুখ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেই জনকল্যাণমুখী হয়েছে। উল্লেখ্য, অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত বাজেটটি প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছিল। এর নেতিবাচক দিকের দায়ভার প্রধানমন্ত্রী নেননি। অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব হলো, তিনি ভালো একটি বাজেট প্রস্তাব করবেন আর এ নিয়ে সংসদে আলোচনা-পর্যালোচনা হবে। প্রধানমন্ত্রী আলোচনান্তে নেতিবাচক দিকগুলো বাদ দেওয়ার জন্য অর্থমন্ত্রীকে নির্দেশ দেবেন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

এ অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তার সুযোগ না দিয়েই ইউজিসি এই অভিন্ন নীতিমালার ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য নেতিবাচক দিকের দায় প্রধানমন্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন বলে এ নীতিমালার ভূমিকায় প্রতীয়মান হয়েছে। এটা শিক্ষকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দূরত্ব তৈরি করার কূটচাল। বাংলাদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ইতিমধ্যে এ অভিন্ন নীতিমালা প্রত্যাখ্যান করেছে। সামনে জাতীয় নির্বাচন। দেশ কতটুকু স্থিতিশীল থাকবে তা অনেকাংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরও নির্ভর করবে। অতীত ইতিহাস তাই বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকরা কিন্তু জাতির ক্রান্তিলগ্নে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়িয়েছেন। ২০০৭-০৮ সালের সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকারের সময় প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ওই সময়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা যখন জেলে অন্তরীণ ছিলেন, তখন এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আদর্শিক কারণে তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ভবিষ্যতেও দাঁড়াবেন। প্রধানমন্ত্রীও এ শিক্ষকদের ঐতিহাসিক ইতিবাচক ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে দাঁড়াবেন বলে আমরা আশা রাখি।

rasel_stat71@yahoo.com